সুখও নয়, দুঃখও নয়, শুধু শান্তি

প্রস্তাবনা

কয়েকদিন আগে প্রশান্তচন্দ্রের কাগজপত্র সব গোছাতে গিয়ে এই লেখাটা হাতে ঠেকলো। ৮ই মার্চ, ১৯৪২ সালে শান্তিনিকেতনে বসে লেখা একখানা চিঠি স্নেহের পাত্রীকে লেখা। এটা এমন একটি চিঠি যেটাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্রের প্রথম পরিচয়ের একটা অধ্যায় যেন ছবির মতো ফুটে উঠেছে। কবির সে সময়কার সহজ নিরাড়ম্বর জীবনযাত্রার কথা এখনকার দিনে অনেকেই জানে না। তাদের কাছে তাই এই লেখাটা অতি মূল্যবান মনে হবে বলে আমি প্রশান্তচন্দ্রের চিঠিখানা ছাপতে দিলাম। কবির সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্রের জীবনের গ্রন্থিবন্ধন দিনে দিনে তিলে তিলে কেমন করে গড়ে উঠেছিল তার ইতিহাসটা ফেলে দেবার মতো জিনিস্ না বলেই আমার বিশ্বাস। আজকের দিনে রবীন্দ্রগবেষণা নিয়ে যাঁরা রত আছেন, তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই এর মূল্য আছে। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য একজন মানুষ, যার সমগ্র জীবনটাই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দিয়ে তৈরী, যিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শকেই নিজের জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন, যাকে রবীন্দ্রনাথেব মন্ত্রশিষ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না, কবির মৃত্যুর বেদনা তার নিজের এই লেখার ভিতর দিয়ে কি রকম করে ফুটে উঠেছে তা সবাই দেখতে পাবে। প্রশান্তচন্দ্রের মনের অনুভূতি কখনো বাইরে প্রকাশ পেত না। অন্তরের গভীরে ফল্গু নদীর মতো স্নেহ ভালোবাসা শ্রদ্ধার প্রবাহ নিত্য বয়ে যেত, কিন্তু বাইরে তার কোনো উচ্ছ্বাস কখনও দেখিনি। তাই যদি কখনও সামান্য প্রকাশের আভাস কোনো দিন দেখেছি তাতেই বুঝতে পেরেছি সেটা কতখানি। যেদিন এই লেখাটা লিখেছিলেন সেদিনকার কথা মনে পড়ছে। সেদিনও আমার স্বামীকে বাইরে থেকে দেখে কেউ বুঝতে পারেনি যে, তাঁর অন্তর জন্ম-মৃত্যুর তরঙ্গে কি রকম উদ্বেল হয়ে রয়েছে সারাক্ষণ। এ বিষয়েও তাঁর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আশ্চর্য মিল।

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

"Uttarayan"
Santiniketan
Bengal
৮ই মার্চ ১৯৪২

কল্যাণীয়াসু,

আট মাস পরে শান্তিনিকেতনে এসেছি। কবি যাওয়ার পরে এই প্রথম। কাল ট্রেনে আসতে আসতে মনে পড়লো। ১৯১০ সালে, প্রায় বত্রিশ বছর আগে এইরকম একটা সকালের গাড়িতেই শান্তিনিকেতনে প্রথম আসি। এসেই কবির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। আর মনে পড়ছে ঠিক এক বছর আগে মার্চ মাসে দিল্লী থেকে ফিরতি পথে এখানে এসেছিলুম। পৌঁছেই কবির সঙ্গে দেখা হোলো। কাল থেকে বারেবারে মনে পড়ছে যে এবার আর দেখা হবে না। থেকে থেকে ভুলে যাই। মনে হয় এখনি দেখতে পাবো পাশে কোথাও রয়েছেন। বুকে মোচড় দিয়ে ওঠে। কাল রাত্রে শুতে গেলুম। কবির সঙ্গে দেখা হয়নি। রাত্রে বারোটা, একটা বাজলো। মাঝে এই বত্রিশ বছরের কত কথা মনে পড়ছিলো। আজ সকালে উঠে কোনো তাড়া নেই। ভোর না হতে রানী উঠে চলে যায়—সূর্য্য ওঠার আগে উনি অপেক্ষা করে থাকবেন! সকালে চায়ের টেবিল থেকে উঠে বড়ো ঘরটার পাশ দিয়ে গেলুম—এই সময়টা আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। ঘরটা এখন museum করা হয়েছে। একবার উঁকি মেরে চলে এলুম। উপরে এসে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি ফাল্গুন মাসে বৌঠানের বাগান ফুলে ফুলে উজ্জ্বল। পরশু কালবৈশাখীর ঝড় হয়ে গিয়েছে—সকালবেলার বাতাস আজও স্নিগ্ধ। দূরে কোপাই নদীর পারে ঘন সবুজ রঙ লেগেছে। সামনে কবির হাতে লাগানো গাছের পাতা আলোয় বাতাসে ঝলমল করছে। চুপ করে বসে আছি। এইরকম কতো সকাল বেলায় কবি গুনগুন করে গান ধরেছেন। পুরানো সব সুর যেন ভেসে আসছে।

বত্রিশ বছর আগের দিনগুলি মনে পড়ছে। অতো বড়ো একটা মানুষকে দেখেছি কতো কাছে থেকে। আজ ছোটখাটো কতো টুকরো দিনের কথা

মনে পড়ছে। বড়ো বড়ো কতো কাণ্ড ঘটেছে, কতো কবিতা, গান, অভিনয়। আজ মনে পড়ছে এ সমস্ত ছাপিয়ে ওঁর কাছে কতো স্নেহ পেয়েছি।

১৯১১ সালের গ্রীষ্মের ছুটীর আগে দুমাস শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে ছিলুম—তখন কলেজে পড়ি, সতেরো আঠারো বছর বয়স। তখন সারাদিন প্রায় ওঁর কাছে-কাছেই থাকতুম। শান্তিনিকেতন পুরানো Guest House-এর দোতলায় পূর্বদিকের সেই ছোটো ঘর-খানায় উনি থাকেন। এই ঘরে বসেই গীতাঞ্জলি, রাজা, ডাকঘর লিখেছেন। মাঝে একটা বসবার ঘর। আমি থাকি পশ্চিমের ঘরে। গ্রীষ্মকাল—আমি একটা মাদুর নিয়ে উপরের বড়ো ছাদে শুতাম।

কবির চাকর ছিল উমাচরণ—সেই আমাকে খাওয়াতো। সন্ধে বেলা আশ্রমের লোকজন দেখা করে যাওয়ার পরে দক্ষিণে গাড়িবারন্দার ছাদটায় উনি বসে থাকতেন একটা লম্বা চেয়ারে। সন্ধের আগেই আমাদের খাওয়া হয়ে যেতো। খুব সাদাসিধা। হয়তো একটু ফল, বা মিষ্টি আর এক গেলাস ঘোলের সরবৎ। রাত্রে সে সময় রান্না হোতো না। সকালবেলা চায়ের সময় পাঁউরুটি আর ফল। দুপুরে একটু ভাত আর দু-একটা নিরামিষ তরকারি—বোধহয় Icmic চলছে। আর কেউ নেই। রথীবাবু বৌঠান, মীরা সকলে শিলাইদায়। উমাচরণই সব ব্যবস্থা করতো। ঐ একজনই চাকর, রাঁধিয়ে সব কিছু।

সমস্ত কিছু ছিল সাদাসিধা। ছোটো ঘরখানায় খুব নীচু করে পাতা ওঁর বিছানা। এককোনে একটা ছোটো নীচু লেখবার ডেস্ক। এ ছাড়া তার আসবাবপত্র কিছু নেই। কয়েকখানা বই ডেস্কের একপাশে আর লেখবার সরঞ্জাম। ঘরে একসঙ্গে দু-তিন জনের বেশি মাটিতে বসবার জায়গা নেই। পাশেই ছোটো স্নানের ঘর। কাপড় চোপড়, পাজামা, পাঞ্জাবি, আর একটা জোব্বাগোছের জিনিষ সেই ঘরেই আলনায় টাঙ্গানো। সিঁড়ির পাশে একটা বাক্সে বোধহয় আর কিছু কাপড় থাকতো। বারান্দায় একটা গোল টেবিলে বসে খাওয়া। এই ছিল তখনকার ব্যবস্থা।

রাত্রে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলতে বলতে দেখতুম উনি চুপ করে আসছেন। আমি ছাদে চলে যেতুম। কোনো কোনো দিন আমিও অনেকবার ছাদে বেড়াতে বেড়াতে দেখতুম কবি তখনো স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। তারপরে গভীর রাতে কখন শুতে যেতেন। সূর্য ওঠবার আগে নীচে এসে দেখতুম যে কবি

তার অনেক আগে উঠেছেন। কোনোদিন বারান্দায় বসে আছেন। কোনোদিন বা মন্দিরে সামনে পূবদিকের চত্বরে গিয়ে বসেছেন। সকালবেলা চায়ের টেবিলে নানা রকম আলোচনা। কখনো কখনো বিদ্যালয় থেকে কেউ আসতেন কাজকর্মের কথা নিয়ে। কখনো অজিত চক্রবর্তী আসতেন কিছু আলোচনা করার জন্য। সকালে অনেকক্ষণ কবি নিজের লেখাও লিখতেন, চিঠির জবাব দিতেন। বেশ একটু বেলায় যেতেন স্নানের ঘরে। এই ছিল ওঁর অবসর। কখনো একঘণ্টা, কখনো দেড়ঘণ্টাও স্নানের ঘরে থেকেছেন। কখনো শুনেছি গান করছেন। দুপুরে খাওয়ার পরে আবার কাজ। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা। লেখা। অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা। এছাড়া মাঝে মাঝে সকালে বা দুপুরে ক্লাশ পড়াতেন। কোনো নতুন গান লেখা হলেই অজিত বা দিনুবাবুকে ডেকে পাঠাতেন। বিকালে এক একদিন গান শেখানোর পালা। সন্ধেবেলায় আবার দু'চার জনের সঙ্গে কথাবার্তা। মাঝে মাঝে খানিকটা বেড়িয়ে আসতেন। কখনো বা বিদ্যালেয়ে যেতেন। দু একদিন নীচু বাংলা থেকে বড়োবাবু (কবির বড়োদাদা) এসে হাজির। খানিকটা দর্শন, বা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা। এই রকম করে দিনের পরে ওঁকে দেখেছি ওঁর সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় এইরকম করে ঘটেছে। শেষের দিকে নিজের কাজ, নানা লোক, নানা ব্যবস্থা নিয়ে ওঁর কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে গিয়েছিলুম। কিন্তু আগে শান্তিনিকেতনে এসে ওঁর কাছেই থাকতুম। বেশির ভাগ সময় কাটতো ওঁর কাছে।

বাঙ্গালী একটা স্বভাব আছে মাখামাখি করা। কবির ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ওঁর নিজের সব ইচ্ছায় চিরদিন একটা দূরত্ব ছিল। তাই এক একদিন যখন তার ব্যতিক্রম ঘটতো তখন ওঁর ভালোবাসার নতুন পরিচয় পেতুম। স্নানের ঘর উনি বরাবর আলাদা ব্যবহার করতে ভালোবাসতেন। তাই ওঁর স্নানের ঘর কখনো কেউ ব্যবহার করতো না। কিন্তু একদিন মনে আছে গ্রীষ্মকালে দুপুরের গাড়িতে এসে পৌঁছেছি তখন বেলা বারোটা একটা হবে। জানতেন আমি আসবো। না খেয়ে অপেক্ষা করছেন। আমি যেতেই বল্লেন, যাও তোমার জন্য জল রেখে দিয়েছি স্নান করে এসো। তখন থাকতেন "দেহলি"র দোতলায়। সেখানে শুধু একটা ঘর। আমি থাকবো Guest House-এ, আরো খানিকটা হেঁটে যেতে হবে। বুঝলুম যে তা ইচ্ছা নয়। অন্য সময় হলে হয়তো না বলতুম। তাড়াতাড়ি স্নানের

ঘরে গিয়ে দেখি একটা পরিস্কার তোয়ালে. জল সব ঠিক করিয়ে রেখেছেন। এই রকম ছোটো ছোটো কতো কথা মনে পড়ছে।

সেও এক গ্রীষ্মের দিনের কথা। পঁচিশে বৈশাখের কাছাকাছি। সারা-দিন অসম্ভব গুমট গরমের পরে প্রকাণ্ড একটা কাল বৈশাখীর ঝড়ে বৃষ্টিতে ধুইয়ে দিলে। তখন ঝড়ের সময় মাঠে ঘুরতে বেরুনো ছিল একটা মস্তো বড়ো আনন্দ। শিলা বৃষ্টির মধ্যে সন্ধে বেলায় খুব দৌড়াদৌড়ি করে কাপড় ছেড়ে ওঁর কাছে গিয়ে বসেছি। হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। একটু পরেই উনি উঠে পাশের ঘরে গেলেন। একটা গরম কাপড় কোথা থেকে বের করে এনে গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললেন, বেশ ঠাণ্ডা আছে। আর বাহাদুরি করতে হবে না। অনেকদিন পর্যন্ত—আমার বিয়ে হবার আগে—ওঁর কিরকম একটা ধারণা ছিল যে আমার খাওয়া দাওয়া বা শোয়া সম্বন্ধে কিছু খেয়াল থাকে না। তাই সর্বদা ওঁর সঙ্গেই আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। আর শুতামও প্রায়ই ওঁর পাশে বা কাছাকাছি কোনো ঘরে। ওঁর বরাবর ছোটো ছোটো ঘরে থাকা অভ্যাস। নতুন নতুন বাড়ি যখন করতেন তখন গোড়ায় অনেক সময় একখানা বই দুখানা শোবার ঘর থাকতো না। তাই ওঁর বসবার ঘরে খাট ফেলে যে কতো শুয়েছি তার ঠিক নেই। একদিনের কথা মনে আছে। বোধহয় ১৯২২ সাল,—৭ই পৌষের উৎসবের আগের দিন বিকালের গাড়িতে এসে পৌঁছেছি। উনি তখন থাকেন "প্রান্তিক" বলে বোধহয় বাড়িটার নাম। একখানা ছোটো শোবার ঘর, আর প্রায় সেইরকমই ছোটো একটা বসবার ঘর, এককোনে সেই মাপের একটি স্নানের ঘর, আর চারদিকে শুধু বারান্দা। শোবার ঘরে একটা ছোটো খাটিয়া ফেলা হোলো। ঘরটা এতো ছোটো যে সেখান থেকে ওঁর তক্তপোষ তিন চার হাত দূরে। মাঝের দরজায় পর্দা ফেলা। তার ঠিক আগে আলিপুরে হাওয়া-আপিসে প্রথম গিয়েছি—উনি কয়েকদিন সেখানে আমার কাছে ছিলেন তখনো আমার বিয়ে হয়নি। জানতুম মীরার জন্য ওঁর মন খুব ব্যথিত আছে। রাত্রে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলবার পরে গিয়ে বারান্দায় বসলেন। আমি শুয়ে পড়লুম। তখন বেশ গভীর রাত। খানিকক্ষণ ঘুমবার পরে হঠাৎ শুনি উনি শোবার ঘরে, বোধহয় বিছানায় শুয়ে শুয়ে, গান আরম্ভ করেছেন।

"অন্ধজনে দেহ আলো
মৃত-জনে দেহ প্রাণ।

তুমি করুণামৃত-সিন্ধু
করো করুণা-কণা দান ॥
শুষ্কহৃদয় মম কঠিন পাষান সম,
প্রেম-সলিল নীরে সিঞ্চহ শুষ্ক বয়ান।"

তখন বোধহয় রাত তিনটা হবে। দুঘণ্টা ধরে বারবার করে গাইতে লাগলেন। আস্তে আস্তে যাতে আমি জেগে না যাই। ভোরবেলা পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে শুনলুম। বুঝলুম যে গানের ভিতর দিয়ে মনকে শান্ত করছেন। এক একটা কথা কতোবার করে ফিরে ফিরে আওড়াতে লাগলেন। বাইরে থেকে গানের সুর শুনেও বোঝা যায় না, যে কতোখানি ভিতরের তাগিদে উনি গান লিখেছেন। শুধু গান কেন ওঁকে কাছে থেকে না দেখলে ওঁর সাহিত্য, ওঁর কবিতা, ওঁর লেখা যে কতোখানি সত্য ছিল ওঁর কাছে তা কেউ বুঝতে পারবে না। ফাল্গুন চৈত্র মাসে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে যখন গান গাইতেন তখন ওঁর সমস্ত শরীর মন যেন সাড়া দিয়ে উঠতো। কাল বৈশাখীর ঝড়ে, বর্ষার দিনেও আবার দেখেছি ওঁর মন কেমন মেতে উঠেছে। যারা শুধু ওঁর লেখা পড়বে তারা কিছুতেই বুঝতে পারবে না যে কতোখানি বাদ পড়লো। এবার শান্তিনিকেতনে এসে থেকে থেকে খালি মনে হচ্ছে যে সমস্ত যেন বদলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ধরে তো রাখা যায় না। আমরাও তো চলেছি। আমাদের দিনগুলিও একে একে নিবে আসছে। কালকের যে দিন সেটা ফুরিয়েছে বলেই তো আজকের দিনটিকে পেয়েছি। আবার আজকের দিনকে না চুকিয়ে দিলে কাল আবার নতুন দিন আসবে কি করে?

এ সবই জানি কিন্তু তবুও মনের মধ্যে ফাঁক থেকে যায়। শুধু কবি সম্বন্ধে নয়। সব জানাশুনা, পরিচয় ভেঙে ভেঙে নতুন করে গড়ছে। যেখানে সৃষ্টি সেইখানেই তাই এত ব্যাথা। কিন্তু মানুষ তবু ধরে রাখতে চায়। আঁকড়িয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সে হোলো মোহ, নিতান্তই মিথ্যা। মহর্ষি শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরে বলে দিয়েছিলেন যে ওঁর কোনো ছবি, কোনো প্রতিকৃতি যেন এখানে না রাখা হয়। ওঁর মনে ভয় ছিল, যে, এই মিথ্যাটাকে মালা চন্দন, ধূপধূনা দিয়ে পূজা ক'রে আশ্রমের আসল সত্যরূপটি চাপা পড়বে। কবি অনেক বার আমাকে এই কথা বলেছেন।

"সদর ষ্ট্রীটে থাকতে বাবামশায় আমাকে ডেকে বললেন, রবি তোমাকে আমি এই কথাটা বলে যাচ্ছি—এ দায়িত্ব তোমার। শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমার কোন প্রতিকৃতি যেন না থাকে।"

তাই এখানে আজ পর্যন্ত আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতার কোন ছবি কোথাও নেই। কবির নিজের মনের ধারাও ছিল ঠিক তাঁর পিতার মতো। আমাকে একদিন বলেছিলেন—

"রামমোহন রায় যে ব্রিস্টলে মারা যান খুব ভালো হয়েছিল। এ দেশ এমন দুর্ভাগ্য—এখানে মরলে হয়তো ওঁকে পূজা করবার একটা জায়গা তৈরী হোতো।"

আজ রথীবাবুর সঙ্গে এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। গোড়ার দিকে "শ্যামলী" বাড়িটায় কবির খাট, বিছানা, চেয়ার, টেবিল, কাপড় চোপড় সব উনি যেমন ব্যবহার করতেন সেই রকম করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। লোকে দেখতে আসতো। ফুল দিয়ে যেতো। তারপরে ধূপধুনাও দেওয়া হয়। রথীবাবু সম্প্রতি জিনিষপত্র সরিয়ে সেখানে অন্য লোকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি অবশ্য তাতে সায় দিলাম। রথীবাবু বললেন, যে, "অথচ বাইরে থেকে যখন লোকজন আসে একটা কিছু ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়। ভাবছি যে, যে ঘরটা উনি সব শেষে করিয়েছিলেন সেটা খালি করে, খুব পরিষ্কার করে রেখে দেবো। সেখানে ওঁর ব্যবহার করা কোনো আসবাব থাকবে না। কিন্তু ওঁর আঁকা এক একখানা ছবি, ওঁর কোনো বই বদলিয়ে বদলিয়ে রাখা হবে।" আমি বললুন, যে, তা হতে পারে কিন্তু এর চেয়েও আরো ভালো হয় অন্য একটা ব্যবস্থায়। শান্তিনিকেতন আশ্রমে বারবার করে কবি বলেছেন এখানকার এই উন্মুক্ত উদার প্রান্তরের কথা—দূরে যেখানে আকাশ আর মাটিতে মিশে গিয়েছে সেখানে পূব দিকে সূর্য ওঠা আর পশ্চিমে আবার সেইরকম করেই ডুবে যাওয়া। এখানকার এই খোলা মাঠের মধ্যে একটা জায়গায় একটু উঁচু করে আশেপাশে ফুলের গাছ দিয়ে সাজিয়ে দিন। তার উপরে হয়তো পাথরের একটি বেদী—কবি ব্যবহার করেছেন এমন কিছু নয়, কিন্তু শুধু দাঁড়াবার বা বসবার একটু জায়গা। কবি নিজের হাতে কাঁটা আর বুনো গাছের বাগান করেছিলেন—সেইরকম ছোটো ছোটো গাছ হয়তো এক এক পাশে। বিস্তীর্ণ প্রান্তর—চারদিক থেকে প্রশস্ত রাস্তা এসে মিশেছে। এই হোলো কবির যথার্থ স্মরণ-চিহ্ন। ওঁর মাটির দেহের কোনো চিহ্ন তাতে নেই—

আছে শুধু ওর ভিতরকার যে কথা তার একটা ইঙ্গিত। এইখানে লোকে এসে দাঁড়াবে। এইখানে খোলা আকাশের নীচে কবির কথা স্মরণ করবে। উৎসবের দিনে এই হবে আশ্রমের সকলের মেলবার জায়গা। কবির কথা যখন ভাবি এ ছাড়া আর কিছুতো তাঁর যোগ্য বলে মনে হয় না।

মানুষের সঙ্গে আমাদের যে পরিচয় তাকেও আমরা বারবার নানা রকম গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করি। কিন্তু তাতে শুধু নিজেকেই ছোটো করি। তাই যেখানে আমাদের সত্যি দরদ সেইখানেই বারে বারে বন্ধন কাটবার প্রয়োজন আছে। তাতে মন ব্যথিত হয় ফিরে ফিরে আঁকড়িয়ে ধরতে চায়। তবু মনে রাখতে হবে, যে, সব চেয়ে বড়ো কথা মুক্ত রূপে জানা। কিন্তু মুখে যতো সহজে বলি মন তো অতো সহজে বোঝে না। থেকে থেকে সমস্ত যেন খালি হয়ে যায়। বারে বারে মনকে সামলাতে হয়। আজ সকালবেলা বসে বসে চেষ্টা করছি সেই অনুভূতিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য যা সুখও নয়, দুঃখও নয়, শুধু শান্তি।

ইতি—

ভুলদা